ইনকিলাব

001

তারিখ 5 DEC 1986
পৃষ্ঠা ৭

ঢাকাঃ শুক্রবার, ১০ পৌষ, ১৩৯৩

খান বাহাদুর আহছানউল্লা

গোলাম মঈনউদ্দিন

খান বাহাদুর আহছান উল্লা

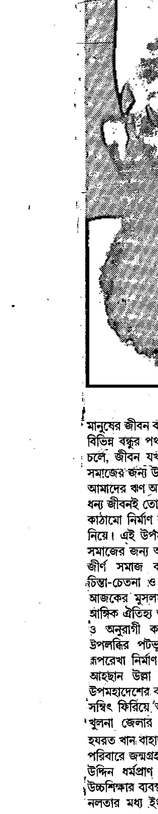

জন্ম ঃ ডিসেম্বর ১৮৭৩ মৃত্যু ঃ ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫

মানুষের জীবন বহতা নদীর মতো। নদী সদৃশ এই জীবন যখন বিভিন্ন বন্ধুর পথ পেড়িয়ে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলে, জীবন যখন ফলবর্তী বৃক্ষে রূপ নেয়; দেশ, জাতি, সমাজের জন্য উৎসার্গিকৃত হয় যে জীবন, সে জীবনের কাছে আমাদের ঋণ অনেক। উত্তরসূরীদের জন্য রেখে যাওয়া এমন ধন্য জীবনই তো ইতিহাসের অংশ হয়, ইতিহাস তার সত্যনিষ্ঠ কাঠামো নির্মাণ করে এমনিতর বরেণ্য জীবন ও জীবন কথা নিয়ে। এই উপমহাদেশে যে সকল ব্যক্তিত্ব দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য অপরিহার্য ছিল, যাদের জন্ম না হলে পুরাতন জীর্ণ সমাজ কাঠামোয় পরিবর্তন আসতো না, যাদের চিন্তা-চেতনা ও জীবনযুদ্ধের ইতিহাস এই উপ-মহাদেশের আজকের মুসলমান ও মুসলিম চেতনা, যাঁরা দেশ-কালের আঙ্গিক ঐতিহ্য ভাবনায় এদেশের মুসলমান জাতিকে আগ্রহী ও অনুরাগী করেছে, জীবন, জীবিকা, বিশ্বাস ও আত্ম উপলব্ধির পটভূমিতে একটি স্বচ্ছ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা নির্মাণ করেছে, তাঁদের মধ্যে হযরত খান বাহাদুর আহছান উল্লা একজন অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি এই উপমহাদেশের বাধানী মুসলিম সমাজের চৈতন্য ও সামাজিক সম্বিৎ ফিরিয়ে আনার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা জেলার নলতা শরীফে হযরত খান বাহাদুর আহছান উল্লা ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুন্সী মোহাম্মদ মুফীজ উদ্দিন ধর্মপ্রাণ ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পুত্রের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। হযরত খান বাহাদুর আহছান উল্লা নলতার মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে ও টাকীর উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯০ খৃস্টাব্দে তিনি ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী স্কুল হতে এণ্ট্রান্স, হুগলী কলেজ হতে ১৮৯২ খৃস্টাব্দে এফএ, প্রেসিডেন্সী কলেজ হতে ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে বিএ এবং একই কলেজ হতে ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে দর্শন শাস্ত্রে এমএ পাস করেন।

এখন থেকে একশ' বছর আগে এ দেশের মুসলমানরা শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন অগ্রণী ছিলেন না। অবশ্য তেমন অনুকূল সুযোগও তখন ছিল না। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা পথিকৃৎ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে হযরত খান বাহাদুর আহছান উল্লার নাম করা যায়। তৎকালীন বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা ১৮২৩ সালে স্থাপিত একটি কমিটির (General Committee of Public Instruction) মাধ্যমে পরিচালিত হতো। এই কমিটি জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশীপ পরীক্ষা গ্রহণ করতো। এর পর কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরে ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় এবং ঐ বছরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু এনট্রান্স পরীক্ষা গ্রহণ করে। ১৮৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম বিএ পরীক্ষা গৃহীত হয়। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল দশ জন। এদের মধ্যে যে দু'জন মাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তাঁরা হলেন, প্রখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু। মুসলমানদের মধ্যে জনাব আহমদ (পরে দেলওয়ার হোসেন নামে পরিচিত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা সমগ্র ভারতের মধ্যে প্রথম গ্রাজুয়েট হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি ১৮৬১ সালে বিএ পাস করেন। এ দেশের আর একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এ, কে, ফজলুল হক এবং হযরত খান বাহাদুর আহছান উল্লা একই বছরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন। ১৮৯৪ সালে নিম্নোক্ত সর্বমোট তের জন মুসলমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন।

আবুল কাসেম	প্রেসিডেন্সী কলেজ
এ, কে, ফজলুল হক	ঐ
মতলুব আহমদ খান চৌধুরী	ঐ
শেখ আহছান উল্লা	ঐ
নূরুদ্দীন আহমদ	ঐ
শেখ ওসমান আলী	ঐ
সৈয়দ হোসেন আলী	ঐ
আবদুল মালেক	সেন্ট মেডিয়ার্স
মাসুদুল হোসেন	ঐ
মোঃ ইচাকিন	ঐ
আলাউদ্দিন আহমদ	ঢাকা কলেজ
সৈয়দ আলী মোহসেন	শিক্ষক
জহুরুল হক	ঐ

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যে, ছাত্রাবস্থায় হযরত খান বাহাদুর আহছান উল্লা নামের আগে পদবী হিসেবে সম্ভবতঃ 'শেখ' ব্যবহার করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর বিভিন্ন লেখায় লেখকের নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ জাতীয় পদবী যুক্ত হতে দেখা যায়নি। হযরত খান বাহাদুর আহছান উল্লা ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন। চাকুরী জীবনের শুরুতে তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের সুপারনিউমারী টিচার-এর পদে অল্প কিছুদিন কাজ করেন। পরবর্তীতে ফরিদপুরের ডেপুটি ইন্সপেক্টর, বাখেরগঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর, চট্টগ্রামের ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর সর্বশেষে অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর পদে উন্নীত হন। এছাড়া তিনি কিছুদিন শিক্ষা বিভাগের অস্থায়ী ডিরেক্টর হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। তাঁর উপর দায়িত্ব ছিল মুসলিম শিক্ষার উন্নতি ও তদারকি। শিক্ষা বিভাগের চাকুরীকালে তিনি মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রভুত উন্নতি সাধন করেন এবং বহু স্কুল-কলেজ, মক্তব-মাদ্রাসা, ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করেন। এতদেশীয় অফিসারদের মধ্যে হযরত খান বাহাদুর আহছান উল্লা সর্বপ্রথম আই, ই, এস, (ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস) অন্তর্ভুক্ত হন। ইতিপূর্বে কোন ভারতবাসীকে শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত করা হয়নি এবং হযরত খান বাহাদুর আহছান উল্লা ১৯২৯ খৃস্টাব্দে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করলে দ্বিতীয় কোন ভারতবাসীকে ঐ পদে নিযুক্ত না করে ইউরোপীয়ান অফিসার মিঃ বটমলিকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেম্বার (সিনেটর) এবং পরে সিণ্ডিকেট-এর সভ্যও মনোনীত হন। শিক্ষা বিভাগের নানা প্রকার উন্নতি সাধন এবং চাকুরী জীবনের সৎ ও সদিচ্ছা প্রসূতী কার্যাবলীর জন্য তৎকালীন সরকার তাঁকে খান বাহাদুর খেতাবে ভূষিত করেন। তিনি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির মেম্বার মনোনীত হন।

হযরত খান বাহাদুর আহছান উল্লার সক্রিয় প্রচেষ্টায় তৎকালীন শিক্ষা বিভাগে তথা মুসলমান শিক্ষায় বিপুল সংস্কার সাধিত হয়। 'মুসলমানদের শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন।' তাঁর প্রচেষ্টায় অনার্স ও এমএ পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লিখবার পরিবর্তে রোল নং লিখবার নিয়ম প্রবর্তন হয়। এর ফলে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব রহিত হয় এবং মুসলমান পরীক্ষার্থীরা ভাল রেজাল্ট করতে শুরু করে। তিনি উচ্চ মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক মাদ্রাসার শিক্ষামান উন্নীত করে মাদ্রাসার পাস করা ছাত্রদের কলেজে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার অনুকূল সুযোগ সৃষ্টি করেন। তিনি সকল স্কুল-কলেজে মৌলভীর পদ সৃষ্টি করেন এবং পণ্ডিত ও মৌলভীর বেতনের পার্থক্য রহিত করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় উর্দু ক্লাসিক্যাল ল্যাংগুয়েজ হিসেবে গণ্য হয়—উর্দু সংস্কৃতের স্থান দখল করে। তিনি স্বতন্ত্র মক্তব পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করেন ও মুসলসমান লেখকের লেখা পুস্তক ব্যবহারের রীতি প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় স্কুল-কলেজে মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তির আনুপাতির সংখ্যা নির্ধারিত হয়, নিউ ভীম মাদ্রাসার সৃষ্টি হয়, মুসলমান মহিলাদের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হয়, টেকস্ট বুক কমিটিতে মুসলমান সভ্য নিযুক্তির ব্যবস্থা হয় এবং পরীক্ষকদের মধ্যে মুসলমান পরীক্ষকের সংখ্যা, শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শক কর্মচারীদের মধ্যে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা, ট্রেনিং কলেজে মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা, স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটিতে মুসলমানদের ন্যূন সংখ্যা নির্ধারিত হয়। মুসলমানদের জন্য তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল কলিকতার বুকে বেকার হোস্টেল, টেলার হোস্টেল, করমাইকেল হোস্টেল, মোসলেম ইনস্টিটিউট প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা তাঁর অমর অবদানের সাক্ষ্য বহন করছে। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার গভর্নর ৩০ জুনের ২৪৭৪ সংখ্যক রেজিলিউশনে মুসলিম শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনটি বিশেষ ধারার সপক্ষে সুপারিশ পেশ করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেন। প্রাদেশিক জনশিক্ষা পর্যদের ডিরেক্টর হর্নেল এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। হজরত খান বাহাদুর আহছান উল্লা এই কমিটির একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন। কমিটির সুপারিশ মুসলিম শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতিতে একটি সুদুর প্রসারী অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

বংগভংগ আন্দোলেনের পরবর্তী যুগের নেতৃস্থানীয় হযরত খান বাহাদুর আহছান উল্লা একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। ইসলামী সাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। 'ইসলামের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের পরিচয় রয়েছে তাঁর প্রবন্ধের সর্বত্র। তাঁর রচনায় ইসলামের আদর্শ ও তত্ত্ব ঐতিহাসিক মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগিতে বিশ্লেষিত হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৭৭। এর মধ্যে জীবনী বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা ১৭, কোরআন ও হাদীস বিষয়ক ৯, শিশু সাহিত্য বিষয়ক ১২, ইসলাম ধর্মের মহাত্ম্য বিষয়ক ৫, ইসলামী বিধান বিষয়ক ১৩, ইতিহাস বিষয়ক ১০, বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ক ১০, আলোচনা ৩, সাহিত্য বিষয়ক ১ এবং বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা ৭। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'বংগ ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য' (১৯১৮) আল-ইসলাম (১৯৩০), শিক্ষাক্ষেত্রে বংগীয় মুসলমান (১৯৩১), ইসলাম রবি হজরত মোহাম্মদ [দঃ] (১৯৫২), তরিকত শিক্ষা (১৯৩১), আমার জীবন ধারা (১৯৪৬), ছুফি (১৯৪৭), সৃষ্টিতত্ত্ব (১৯৪৯), ছেলেদের মহানবী (১৯৫১), বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী (১৯৬৪), মহাপুরুষের অমিয় বাণী (১৯৫০), ইসলামের মহতী শিক্ষা (১৯৪৯), মোছলেমের নিত্য জ্ঞাতব্য (১৯৪৯), টিচার্স ম্যানুয়েল (১৯১৫) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'আমার জীবন ধারা' গ্রন্থটিতে হযরত খান বাহাদুর আহছান উল্লার জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। মার্কিন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান একটি বইয়ের ভূমিকা লিখতে গিয়ে যে কথা বলেছিলেন তা উপযুক্ত বইটির ক্ষেত্রেও যথার্থ বিবেচিত হতে পারেঃ

"Comrade, This is not a book—
Who touches it, touches a Man."

হযরত খান বাহাদুর আহছান উল্লার মনমানসিকতা, বিশ্বাস ও জীবনবোধের একটি চমৎকার পরচিয় মিলবে এ বইতে। বইটি তাঁর সুদীর্ঘ সংগ্রামী জীবন, সমাজ সেবা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংস্কার এবং সর্বোপরি সামাজিক ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিথীয় তাঁর অপরিসীম ঐকান্তিকতা ও কার্যক্রমের পরিচয় বহন করে। তাঁর রচিত অর্ধশতাধিক বই তৎকালীন মুসলিম মানস গঠনে অসামান্য অবদান রাখতে সফল হয়। এ ছাড়াও মুসলমান লেখকদের উৎসাহিত করার জন্য তিনি কলিকাতার বুকে 'মখদুমী লাইব্রেরী' ও 'এম্পায়ার বুক হাউস' প্রতিষ্ঠা করেন। 'আনোয়ারা' 'বিষাদসিন্ধু'র মতো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি এই প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর স্থাপিত মখদুমী লাইব্রেরী দেশবিভাগপূর্ব যুগে ইসলামী গ্রন্থ প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করে।

ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির প্রশ্নে খানবাহাদুর আহছানউল্লা সাহেব সকল সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে ছিলেন। ১৯১৮ সালের ২১ এপ্রিল যশোহর-খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য সমিতির একটি বিশেষ অধিবেশনে 'বঙ্গ ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য' শীর্ষক যে মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাঁর এক জায়গায় তিনি বলেছেনঃ

'ভাষার সহিত সাহিত্যর অতি নিকট সম্বন্ধ। সাহিত্যের উন্নতি জাতীয় উন্নতির পরিচায়ক।...... একাল পর্যন্ত মাতৃভাষার কূটতর্ক লইয়া সকলেই ব্যস্ত ছিলেন। উর্দু আমাদের মাতৃভাষা মনে করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য কেহ অগ্রসর হন নাই। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সে তর্ক মিটাইয়া দিয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে বঙ্গ ভাষায় সাহিত্য রচনা করা আবশ্যক।'

হযরত খান বাহাদুর আহছানউল্লার সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলা একাডেমী তাঁকে 'ফেলো' সম্মানে ভূষিত করে। বাংলা একাডেমীর কর্মপরিষদ ৪ মে, ১৯৬০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩২তম সভায় তাদের পুরস্কার উপসংয়ের নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেঃ

In View of the long literary services rendered to the Bengali literature in general and Bengali literature of East Pakistan in particular, it is recommanded that the fllowing literary persons be offered the honour of being the Fellow of Academy :

1. Khan Bahadur Ahsanullah
2. Shaik Reajuddin Ahmed
3. Shaik Habibur Rahman, Sahitya Ratna
4. Nurunnesa Khatun, Viodya Vinodini

বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক এ সম্পর্কে একাডেমী পরিত্রকায় প্রতিবেদনও রাখেন এবং হযরত খান বাহাদুর আহছানউল্লাকে নিম্নোক্ত পত্র লেখেনঃ

পত্রের সংখ্যা ৮০২২-বা,এ,

১৪ই জুলাই, ১৯৬০

প্রেরকঃ পরিচালক, বাংলা একাডেমী,
বর্ধমান হাউস, ঢাকা।

জনাব,

বিগত ৪ ও ৫ মে তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমীর কর্মপরিষদের ৩২তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি আপনাকে সানন্দে জানাইতেছি যে, বাংলা সাহিত্যে আপনার বিশিষ্ট ও বহুমুখী দানের স্বীকৃতিরূপে একাডেমী আপনাকে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির 'ফেলো' বা 'সম্মানিত সদস্যে'র মর্যাদা দিয়া নিজেকেই গৌরবান্বিত মনে করিতেছে।

অতঃপর, আপনি যথানিয়মে একাডেমীর যাবতীয় সুখ-সুবিধা ভোগ করিবেন। আপনার বিশেষ অবগতির জন্য এতদসঙ্গে আবশ্যক কাগজ-পত্র পাঠাইলাম।

আশাকরি, একাডেমী আপনার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতা হইতে কখনও বঞ্চিত হইবে না।

ইতি—
আপনার একান্ত অনুগত
স্বাঃ/মুহাম্মদ এনামুল হক

পরম শ্রদ্ধেয়
জনাব খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ্
সাহেবকে লিখিত,
৯, আরমেনিয়ান স্ট্রীট, ঢাকা।

হযরত খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা 'নিজ গ্রামের উন্নতিবিধানে..... সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। নলতা হাইস্কুল ও জামে মসজিদ তারই কীর্তি বহন করে।' হযরত খান বাহাদুর আহছানউল্লা ছিলেন মনে-প্রাণে একজন শিক্ষাবিদ। তিনি শিক্ষা সংস্কার করেছেন, অসংখ্য শিক্ষালয় স্থাপন করেছেন। শিক্ষা সম্পর্কিত হযরত খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লার এই অবদান দেশ-জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। হযরত খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ অন্তর্জীবনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্ম সাধনা ও সমাজ সেবা। বর্তমানে তিনি একজন কামেল পীর হিসেবে সুপরিচিত। নিজ গ্রাম নলতা শরীফে তাঁর পবিত্র মাজারে প্রতি বছর অসংখ্য ভক্তপ্রাণ মানুষের জমায়েত হয়। 'আহছানিয়া মিশন' তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। সৃষ্টের সেবা ও স্রষ্টার এবাদত এই মিশনের মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানে সারা বাংলাদেশে আহছানিয়া মিশনের অর্ধশতাধিক শাখা মিশন ধর্মীয় ও সমাজসেবামূলক কার্যে নিয়োজিত আছে। 'সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, জ্ঞানের সাধনা, কর্মের মধ্যে আত্মপ্রকাশ দ্বীন ইসলামের মর্মার্থ প্রচার, প্রসারের মাধ্যেমে তিনি এক অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন।' উল্লেখ্য, খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা সাহেব সমাজ সেবা, সমাজ সংস্কার— বিশেষ করে দ্বীনি প্রচার কার্যে যে অবদান রেখে যান তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রয়াসে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পুরস্কার ১৪০৫ হিঃ (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়েছে। হযরত খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যারিস্টার সামসুজ্জোহা হাইকোর্টের অফিসিয়াল রিসিভার ও পরে ঢাকার এডমিনিস্ট্রেটর পদে কর্মরত ছিলেন। পুত্রবধু মিসেস ফজিলাতুননেসা বাঙ্গালী মুসলমান মহিলাদের মধ্যে প্রথম উচ্চশিক্ষিতা মহিলা হিসেবে সমাদৃতা ছিলেন। তিনি কলিকাতার বেথুন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ও ঢাকা ইডেন গার্লস কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। এঁদের দু'জনের কেউই বর্তমানে জীবিত নেই।

১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারী হযরত খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা নিজ গ্রাম নলতা শরীফে ইন্তেকাল করেন।